ইচ্ছামতী

সূচীপত্র

প্রথম পাতাঃ শীত সংখ্যা ২০০৮ 1

ছড়া-কবিতা: অটোগ্রাফ 3

গল্প-স্বল্প 5

বড়দিন 5

বন্ধু কোথায় 7

ফেস্টিভ্যাল অফ লাইট 9

আনমনে: আমার ছোট্টবেলাঃ পর্ব ১ 11

পড়ে পাওয়া: হে অরণ্য কথা কও 13

গত সংখ্যায় পেয়েছি: জসীম উদ্দীন 14

মনের মানুষ: ওবিন ঠাকুর ছবি লেখে 15

দেশে-বিদেশে 17

হারবিন 17

ইয়েলোস্টোন ন্যাশানাল পার্ক 21

ছবির খবর: ছবির উতসব 26

বায়োস্কোপের বারোকথা: সেই প্রথম ছবি 27

পরশমণি: আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু 29

জানা-অজানা: ঘুড়ির ইতিহাস 31

এক্কা-দোক্কা: পিবে-ডি-অরো 33

আঁকিবুকি 36

প্রথম পাতাঃ শীত সংখ্যা ২০০৮

সকালবেলা ঘুম ভেঙ্গে উঠে গা'টা কি একটু বেশি শিরশির করছে? জানলার পর্দা সরিয়ে বাইরে উঁকি দিলে দেখা যাবে সাদা কুয়াশায় আবছা হয়ে আছে চারিদিক। সেই কুয়াশার ঘেরাটোপ সরিয়ে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে নরম রোদ। বাগানে বা ব্যালকনি তে টবে ফুটে উঠেছে হলুদ-সাদা চন্দ্রমল্লিকা, কমলা গাঁদা আর লাল-গোলাপি ডালিয়া। স্কুলে যাওয়ার পথে বাজারের ধারে হটাত করে চোখ আটকে গেলো - ফলওয়ালার ঝুড়ি ভরে আছে মিষ্টি কমলা রঙের কমলা লেবুতে। দুপুর শেষ হতে না হতেই ঝুপ করে সন্ধে নেমে আসছে ...সন্ধেবেলা এক মন মাতানো গন্ধে ঘর ম -ম করছে ... দিদা যে রান্নাঘরে নতুন গুড়ের পিঠে বানাচ্ছেন ...এসে গেছে শীত ঋতু। আর এসে গেছে ছোটদের ই-পত্রিকা ইচ্ছামতীর দ্বিতীয় সংখ্যা - শীত সংখ্যা ২০০৮।

তোমাদের মধ্যে যারা ইচ্ছামতীকে প্রথম সংখ্যা থেকেই চেনো, তারা অনেকেই আমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছ তোমাদের ভাললাগার কথা। যারা চিঠি লেখনি, তারা অন্যান্য ভাবে তাদের ভাললাগার কথা জানিয়েছ। তোমাদের চিঠি আর মতামত ইচ্ছামতীকে আরো সুন্দর হয়ে উঠতে সাহায্য করবে। যারা ইচ্ছামতীকে প্রথম দেখছ, তাদের জানাই - শুধুমাত্র ছোটদের জন্য নয়, যারা দেখতে বড় কিন্তু মনে মনে সেই ছোট্টটিই রয়ে গেছে, তাদের ও সবার জন্য রইল ইচ্ছামতী।

নতুন বছর ২০০৯ আসতে আর মাত্র কয়েকদিন বাকি। এই সময়টা কিন্তু বেশ খুশির সময়। অনেকের ই স্কুলের পরীক্ষা শেষ। কারোর কারোর আবার লম্বা ছুটি। মাঝে মাঝে উত্তর দিক থেকে ধেয়ে আসছে ঠান্ডা হাওয়া। এইরকম শীতের দুপুরবেলা নরম রোদে পিঠ দিয়ে কমলালেবু খাওয়ার মজাই আলাদা। এই সময় ই তো যত পিকনিক, ক্রিকেট খেলা আর বেড়াতে যাওয়ার সময়। নতুন বছরের প্রথম দিনে আমাদের প্রার্থনা থাকে যেন আগামি দিনগুলো আরো সুন্দর, আরো আনন্দে ভরে ওঠে। "নিউ ইয়ার্স ইভে" নতুনকে বরন করে নেওয়ার উতসবে মেতে ওঠে সবাই। কিন্তু সব আনন্দের মাঝখানে আমরা যেন কিছুতেই না ভুলে যাই গত ২৬ -২৮ নভেম্বর, সেই ভয়াবহ তিন দিনের কথা। মুম্বই নগরে, সেই ভয়ানক তিন দিনে আমরা হারিয়েছি কত কত নিরীহ মানুষকে, কত বীর সৈনিক কে। তাদের সবার আত্মার শান্তি কামনা করে, আমাদের সব কাজের মাঝে, আমরা যেন মনে রাখি, আমাদের লড়তে হবে হিংসার বিরুদ্ধে, হানাহানির বিরুদ্ধে। এই পৃথিবীতে শান্তি ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব ছোট-বড়, আমাদের সবার।

ছোট্ট ইচ্ছামতী কিন্ত এই কদিনে বেশ বড় হয়ে উঠেছে। এই সংখ্যায় শুরু হল কয়েকটি নতুন বিভাগ। গত সংখ্যার "লেখালিখি" বিভাগে বলেছিলাম গল্প লিখে "হাত পাকানো"র বিষয় হল "বড়দিন"। কিন্তু হাত পাকানো নয়, আমরা পেয়ে গেছি "বড়দিন" নিয়ে লেখা দুটি দুইরকমের সম্পূর্ণ ছোট গল্প। আর বড়দিন নিয়ে না হলেও, গল্প লিখতে হাত পাকিয়েছে আমাদের এক স্কুল পড়ুয়া পাঠিকা। এই সংখ্যা থেকে আরো শুরু হচ্ছে সিনেমার ইতিহাস নিয়ে ধারাবাহিক "বায়োস্কোপের বারোকথা"। আছে আরেকটা ধারাবাহিক, "আমার ছোট্টবেলা" যেখানে প্রায় ৬০ বছর আগে বাংলাদেশে শৈশব কাটানো এক পাঠক জানাচ্ছেন তাঁর অন্যরকম ছোটবেলার কথা। এছাড়াও আরো কতগুলি নতুন বিভাগ শুরু হল। সেগুলি কি? -জানতে হলে ইচ্ছামতীকে প্রথম থেকে শেষ অবধি পড়ে ফেলতে হবে। আর কেমন লাগছে ইচ্ছামতীকে, তা অবশ্যই আমাকে জানাতে হবে চিঠি লিখে।

শেষে কিছু পুরানো কথা আরেকবার বলি। এই ওয়েবসাইট তৈরি হয়েছে Unicode font ব্যবহার করে। এই ওয়েবসাইট সবথেকে ভাল দেখা যাবে Firefox Browser এ। Firefox Browser এবং Unicode font কি করে ডাউনলোড করবে, তার বিবরণ " Problem Reading Bangla " লিঙ্ক এ দেওয়া আছে। Internet Explorer 6 & *7* browser দুটি একটি অক্ষর ঠিক করে দেখাতে পারছে না। তাই আমরা "উত্‌সব", "হঠাত্‌" এই সব শব্দে 'খন্ড ত' এর বদলে 'ত -এ হসন্ত' ব্যবহার করেছি। না হলে দেখতে খারাপ লাগছে। যাঁরা সব খুব গম্ভীর চশমাআঁটা পড়ুয়া, ভুল বানান দেখলেই রেগে যান, তাঁরা নিশ্চয় আমাদের ওপর এই কারণে রেগে যাবেন না।

নতুন বছর ২০০৯ সবার ভালো কাটুক।

চাঁদের বুড়ি

ছড়া-কবিতা: অটোগ্রাফ

খ্যাতনামা লোকেদের অঙ্গে
কলম থাকে সদা সঙ্গে।

না থাকলেও ক্ষতি নেই,
অনুরাগী এগিয়ে দেবে ভাই!

যদি তাঁরা প্রশ্ন করেন কি চাই?
"যদি দেন একটা সই"

সই দিয়ে ব্যথা হয় হাতে,
অনুরাগী ধন্য হয় তাতে।

ছাত্রের খাতায় থাকে শিক্ষকের সই
যদিও তা দিয়ে ছাত্রের প্রয়োজন নেই

প্রয়োজন আছে তার অভিভাবকেরঃ
তিনি দেখবেন কত উন্নতি হচ্ছে ছেলের!

"বিল" পাস হতে লাগে রাষ্ট্রপতির সই,
অধিকাংশ এম পির ও স্বাক্ষর চাই।

পাঁচ থেকে পাঁচশ টাকার নোটেও থাকে,
আর বি আই গভর্নরের সই, একটা ফাঁকে।

সই জাল করা নিয়ে হল কত গল্প
ছায়াছবির খোরাক ও হয়েছিল অল্পস্বল্প।

বিখ্যাত আঁকিয়েদের ছবি, যা দাগ কাটে মনে,
তাতেও থাকে স্রষ্টার সই, ছবির এক কোণে।

প্রথম অটোগ্রাফ দিতে গিয়ে কি আনন্দ হয়,
নিজে ছাড়া কাউকে কি বুঝিয়ে বলা যায়!

কত বিখ্যাত লোক ই করেন একথা স্বীকার,
তার মধ্যে লুকিয়ে আছে কত গল্প মজার!

কিশোরদের খাতার পেছনে দেখতে পাওয়া যায়
হিজিবিজি আঁকিবুকি কে বুঝবে তায়?

কিন্তু যদি একটুখানি ভেবেচিন্তে দেখ,
বুঝতে বেশী সময় লাগবে নাকো -

কতরকম স্বাক্ষর নিয়ে পরীক্ষা করা,
সবচেয়ে ভাল যেটা, সেটা মক্স করা।

কারন শুধু একটাই,
ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে তাই।

যদি বিখ্যাত হয়ে যাই!!
তখন তো একটা জবরদস্ত সই চাই!

তাই তো বলি ভাই,
স্বাক্ষরের অনুশীলন চাই।

কৌস্তুভ রায়
আহমেদাবাদ

গল্প-স্বল্প

বড়দিন

টুকাইয়ের মন ভালো নেই।

যেদিন ওর মা পঞ্চমীর হাত ধরে এই বাড়িতে কাজে ঢুকেছে, সেদিন থেকেই ওর ছোট্ট জীবনটা যেন পাল্টে গেছে। কাজ তেমন কিছুই না। এ বাড়ির মামা অফিসে যায়,মামী কলেজে পড়ায়। সারাদিন ফাঁকা বাড়িতে দেড় বছরের পিন্টুর সঙ্গী টুকাই। মা এই বাড়িতে রান্না করে আরও তিন বাড়িতে কাজে যায়। তারপর ওকে মামা-মামীর এঁটো বাসন মেজে, ঘর ঝাড়া-মোছা করে দিতে হয়, ওরা থাকতে থাকতেই। এরপর পিন্টুকে চান করানো,খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো-ওর নিজেরই ঘুম পায়।

খেয়ে উঠতে বেলা গড়িয়ে যায়। মামী ফিরে আসে। চা করে দিয়েই পিন্টুকে নিয়ে ও পার্কে যায় বেড়াতে। মামা ফিরবার পর কেউ না কেউ আসে বাড়িতে। পিন্টুর জন্য খেলনা, জামাকাপড় নিয়ে আসে। সবাই বলে মেয়েটাকে তো বেশ পেয়েছো, দাও না ভাই আমাদের জন্য একটা দেখে। মামা ভালো ভালো খাবার আনে। সবার হয়ে গেলে ও একটু ভাগ পায়। রাতে খাবার টেবিলের পাশে, মাটিতে বসে ও খায়। মেঝেটার ঠান্ডা লাগে ইজেরের তলা দিয়ে। ও বলে না কিছু।

রান্নাঘরের পাশে মাটিতে ওর বিছানা। সবাই শুয়ে পড়লে পুতুলটা বার করে। তার একটা চোখ নেই। চুলগুলোও উঠে গেছে। অনেকদিন আগে বাবা কিনে দিয়েছিলো। বাবা এখন জেলে। একদিন স্বপনকাকু আর মা-কে নিয়ে কী একটা হয়েছিল। বাবা খুব মারলো স্বপনকাকুকে। তারপর পুলিশ এসে বাবাকে ধরে নিয়ে গেলো। স্বপনকাকু এখন আর আসে না।বগলে একটা কাঠের ডান্ডায় ভর দিয়ে হাঁটে। বাবা টুকাইকে খুব ভালোবাসতো। অনেক লেখাপড়া শেখাবে বলেছিলো। মামী পিন্টুকে 'অ-আ-ক-খ' আর 'এ-বি-সি-ডি' শেখাতে চেষ্টা করে। টুকাইও একটু একটু শেখে, আবার ভুলে যায়। তাতে কিছু না, কাজগুলো ভুললেই ভয়।

মামা-মামী অবশ্য খুব ভালো। পিন্টুর অনেকরকম দিদি আছে,তাদের ছোটো হয়ে যাওয়া পুরনো জামা

মাঝে মধ্যেই এনে দেয়। গাড়ি করে বেড়াতে গেলে ওকে নিয়ে যায়। চিড়িয়াখানাও নিয়ে গিয়েছিলো। তবে পুজোর সময় গোয়া না কোথায় গিয়েছিলো অনেক দিনের জন্য তখন টুকাই মার কাছেই ছিলো। ওরা ফিরে আসার পর ছবিগুলো দেখেছিলো টুকাই। কী দারুণ! পাহাড়, সমুদ্র -কী নীল। পিন্টু কি মজা করেছে ওখানে। সেই প্রথম ওর পিন্টুকে হিংসা হয়েছিলো।

আজ সকালে একটা মজা হয়েছে।

পাশের বাড়িতে একটা দাদু থাকে, সব চুল সাদা আর ইয়া মোটা। মূর্তি গড়ে। মাঝে মাঝে অনেক লোক আসে বাড়িতে ট্রাকে চাপিয়ে বিরাট বিরাট কালো সাদা মূর্তি নিয়ে যায়। আজ মামা-মামী চলে যাবার পর ও পিন্টুকে নিয়ে বারান্দায় বসে আছে, দাদুটা ডাকলো। কিন্তু কিন্তু করেও দরজায় তালা দিয়ে, পিন্টুকে নিয়ে ও দাদুটার বাড়ি গেল।

দাদুটা ওকে নিয়ে গেল বিরাট একটা ঘরে। বাব্বা! সেখানে কত পুতুল আর মূর্তি। মানুষ, বাঘ,বেড়াল, গণেশ আরও কত কী! আবার একটা কাঠের গুঁড়ির মধ্যে তিনটে বানর ছানা। টুকাই তো হাঁ।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলো নিজেরই খেয়াল নেই। হঠাত দাদুটা বললো,"দ্যাখতো চিনতে পারিস কিনা?" এ কী? যে গোল টেবিলটার ওপর একতাল মাটি ছিলো-সেখানে ওটা কে? ও মা! এ যে টুকাই নিজেই। দাদু বললো,"তুই এতো সুন্দর দেখতে, তাই ভাবলাম তোকে বাড়িতেই রেখে দিই। এবার বল দেখি,হয়েছে কিনা তোর মতো?"

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে,এক ছুট্টে ও বাড়ি চলে এলো পিন্টুকে নিয়ে। অনেকক্ষণ লাগলো বুক ঢিপঢিপটা ঠিক হতে। তারপর ও বুঝলো মনটা ভালো হয়ে গেছে। আর কক্ষোণো পিন্টুকে হিংসা করবে না টুকাই।

পার্থ দাশগুপ্ত
কলকাতা

বন্ধু কোথায়...

অ্যানুয়াল পরীক্ষা শেষ। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো রিয়া আর মৌনিকা। উফ যা টেনশান।

এখন কয়েকটা দিন শুধু মজা। রিয়া মৌনিকাকে বললো,"এবারের ছুটিতে কোথায় বেড়াতে যাওয়া যায় বলতো? "

মৌনিকা তখনি বললো, "আমি একটা সুন্দর জায়গা জানি। জায়গাটার নাম দেবপুর। সেখানে আমলকি গাছের ওপরে পাখিরা গান করে। নীচে পড়ে থাকা আমলকি কুড়োতে ভিড় করে কতশত কাঠবেড়ালী। মাঠ জুড়ে ঘুরে বেড়ায় হরিণের দল। দূর থেকে ভেসে আসে ঝরণার জলের ঝিরঝির শব্দ।" আনন্দে রিয়া লাফিয়ে উঠলো। মৌনিকাকে জড়িয়ে ধরে বললো, "কেমন করে আমরা যাবো দেবপুর?" মৌনিকা বললো, "কেন ট্রেনে করে। সেখানে তো আমার মাসির বাড়ি।"

বাড়ি গিয়ে বাবা -মা দের রাজি করানোটা অবশ্য একটু মুশকিল হল প্রথমে। দুই বাড়ির বড়োরা কেউ রাজি হচ্ছিলেন না দুজন কে একা একা ছেড়ে দিতে। কিন্তু শেষ অবধি মৌনিকা আর রিয়া ই জিতে গেল। দেবপুর লোকাল ট্রেনে ঘন্টাখানেকের পথ, আর ওখানে স্টেশনে মেসো নিতে আসবেন। তাছাড়া দুজনের কাছেই তো মোবাইল ফোন আছে, তাই চিন্তা কিসের? বাবা মা তো চাইলেই কথা বলতে পারবেন।

চারদিনের মাথায় সক্কালবেলা দুই বন্ধু রিক্সা চেপে মনের আনন্দে স্টেশনে পোঁছোলো। মৌনিকা গেল লোকাল ট্রেনের টিকিট কাটতে আর রিয়াকে সব জিনিপত্র দেখার জন্য একটা বেঞ্চিতে বসতে বললো। রিয়া মৌনিকাকে বললো, "শোন টিকিট কিনে ফেরার সময় একটু ঝালমুড়ি কিনে আনিসতো। খুব ক্ষিদে পেয়েছে।" মৌনিকা খিচমিচ করে উঠলো, "এইতো বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে লুচি,ফুলকপির তরকারি,নলেন গুড়ের সন্দেশ সব চেটেপুটে খেলি। আবার এখনি তোর ক্ষিদে পেয়ে গেলো?" রিয়া তবুও ঘ্যানঘ্যান করতে থাকলো। মৌনিকা বললো,"আচ্ছা বাবা নিয়ে আসছি। কিন্তু চুপটি করে বসে থাকবি কোথাও যাবি না।"

আসলে দুজনে একক্লাসে পড়লেও মৌনিকা একটু বেশি হম্বিতম্বি করে। রিয়া কিছু বলে না। আসলে ওরা

দুজনে খুব ভালো বন্ধু। একে অন্যকে ছাড়া থাকতে পারে না।

টিকিট কাউন্টারে গিয়ে মৌনিকা দেখলো বিশাল লাইন। সবাই বেড়াতে যেতে চাইছে। মৌনিকা সেই ভিড় লাইনে দাঁড়িয়ে ঝালমুড়িওলাকে খুঁজতে থাকলো। এমন সময় মৌনিকা শুনতে পেল প্রচন্ড গোলা-গুলি আর বিস্ফোরণের শব্দ। পিছনে ফিরে দেখে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে,চারিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে অসহায় মানুষ। মৌনিকা কি করবে বুঝে উঠতে পারলো না। বাইরে বসে আছে তার প্রিয় বন্ধু রিয়া। সেখান থেকেই ছুটে আসছে আগুনের হল্কা,গুলির শব্দ। মৌনিকা ছুটে বাইরে যেতে চায়। কিন্তু পারে না। একজন কম্যান্ডো অফিসার ততক্ষণে ধরে ফেলেছেন মৌনিকাকে। চেঁচিয়ে বলছেন, "কেউ ওদিকটায় যাবেন না। ব্যারিকেডের পাশের ঘরটায় চলুন। হ্যাঁ টিকিট ঘরের পেছনের ঘরটায়।" মৌনিকা কম্যান্ডো অফিসারকে বোঝাবার চেষ্টা করলো তার প্রিয় বন্ধু রিয়া বাইরে। অফিসার কোনো কথা শুনলেন না। বললেন,"আপনারা কেউ বাইরে বেরোবার চেষ্টা করবেন না। কেউ ডাকলেও দরজা খুলবেন না। জঙ্গীরা গোটা শহরটা ঘিরে ফেলেছে।"

ঘরবন্দি মৌনিকা বারবার রিয়াকে মোবাইলে ট্রাই করলো। কিন্তু পেল না। বাড়িতে ও করল, সেখানেও পেল না। গভীর চিন্তা আর অবসাদে তার সারারাত কাটলো। মোবাইলের নেটওয়ার্ক কখন চলে গেছে খেয়াল নেই। কারো খাওয়া নেই, ঘুম নেই। একটু খাবার জল নেই। বড় ঘরটায় শুধু নেই আর নেই এর বিলাপ। বাথরুমের গন্ধ। ঠিক কখন মনে নেই, হয়তো বিকেলের দিকে ঘরের বড় দরজাটা খুললো। সেই কম্যান্ডো অফিসার বললেন, "আপনারা সবাই বিপদ মুক্ত।" ঘর থেকে বেরিয়েই মৌনিকা ছুটলো সেই বেঞ্চির দিকে যেখানে রিয়া কাল সকালে বসেছিলো। কিন্তু কোথায় রিয়া? চারিদিকে শুধু চাপচাপ রক্ত, মানুষের ছিন্নভিন্ন দেহ, পোড়া মাংসের গন্ধ। কিন্তু ওটা কি? আরে ওই তো রিয়ার লাল রঙের ব্যাগ। এগিয়ে যায় মৌনিকা। তারপর শুধু তাকিয়ে থাকে গুলিতে ঝাঁঝরা তার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু রিয়ার নিথর দেহের দিকে।

ততক্ষণে মৌনিকাকে ঘিরে ধরেছে টেলিভিশন চ্যানেলের ক্যামেরা। সাংবাদিকরা প্রশ্ন করে যাচ্ছে একের পর এক। কী দেখেছো? তোমার কেমন লাগছে? আর কে কে ছিলো?মৌনিকা মাথা নীচু করে আস্তেআস্তে হাঁটছিলো। এবার সে দাঁড়িয়ে পড়লো। যারা এতক্ষণ তাকে প্রশ্ন করছিলো তাদের দিকে তাকিয়ে বললো, "আমি ঝালমুড়িওলাকে খুঁজছি। কাল রিয়া,আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু ঝালমুড়ি খেতে চেয়েছিলো।" এই প্রথম মৌনিকা আর কথা বলতে পারলো না। তার চোখ আর গাল বেয়ে গড়াতে থাকলো সেই ঝিরঝিরে ঝরণাটা। যাকে দেখতে যাওয়ার কথা ছিলো মৌনিকা আর রিয়ার।

সৃজনী লাহিড়ী
সপ্তম শ্রেণী,পাঠভবন,ডানকুনি

ফেস্টিভ্যাল অফ লাইট

বহু বছর আগের কথা। তখন আসানসোল আজকের মত জনবহুল শহর ছিল না।ছিল না এত ব্যস্ততা। মহকুমা হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে মাত্র। ধস ধস শব্দ করে হাজার রকমের কলকব্জা পেটে পুরে ই-আই-আর লাইনের ইঞ্জিন যাওয়া আসা করত হরদম। ভোঁস ভোঁস করে ধোঁয়া ছাড়ত বিশাল বিশাল স্টীম ইঞ্জিন গুলো। দূরে আকাশে কুন্ডলি পাকাতে পাকাতে মিশে যেত সেই ধোঁয়া। জানলায় দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে দেখত হিল্ডা। সামনে ফাঁকা মাঠ আর ঝুপড়ি জঙ্গল, তার ওপাশে কাঁটা তারের বেড়ার ফাঁক দিয়ে ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে ইঞ্জিনের চাকা ঝিক ঝিক ঝিক ঝিক, ওর মনটাও যেন চলত সেই সঙ্গে। ফাদার বলতেন, "বাছা, জানলা বন্ধ করে দাও"। নিঃশব্দে জানলা বন্ধ করে সরে যেত হিল্ডা।

সেই কোন ছোট্টবেলায় ফাদার জেকব হিল্ডাকে এনেছিলেন এই মিশনারি স্কুলে, কোথায় তার বাড়ি ছিল, কিছুই তার মনে পড়েনা। এখানেই সে পড়াশোনা করে। শহরের একপ্রান্তে এই মিশনারি স্কুল ই তার বাড়িঘর সবকিছু। এই স্কুলে পড়াশোনা করে খনি অঞ্চলের গরিব দুঃখী ছেলেমেয়েরা আর থাকে অনাথ শিশুরা। ফাদার হিল্ডাকে একদম ছোট ছেলেমেয়েদের দেখাশোনার ভার দিয়েছেন। হিল্ডা তাদের সাথে গল্প করে, খেলা করে। মিশনের গরুগুলোকে জল দেওয়া, বাগানের ছোট ছোট চারাগাছগুলোর যত্ন নেওয়া তার কাজ। সন্ধ্যায় যখন গীর্জার ঘন্টা বাজে ঢং ঢং করে, সেই শব্দে উড়ে যায় ঝাঁকে ঝাঁকে বক, কাক, আরো কতরকমের পাখি। হিল্ডা অবাক হয়ে দেখে ওদের মুক্ত ডানায় ভর দিয়ে উড়ে যাওয়া। এক চক্কর দিয়ে আবার এসে বসে গাছে। তখন ফাদার পিয়ানো নিয়ে বসেন। প্রার্থনা হয়ে গেলে হিল্ডা কে গান শেখান। বড়দিনের উতসবে হিল্ডা সেই গান গায়।

হিল্ডা হাঁটে চলে নিঃশব্দে, পরনে তার সাদা পোশাক, মুখে তার যেন সর্বদা এক বিষাদের ছায়া। দূরে দেখা যায় মস্ত ইঞ্জিন ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ঘাসের গালিচা ভেদ করে আঁকাবাঁকা লাইনের উপর দিয়ে চলেছে। হিল্ডার মন চলে যেতে চায় তার সঙ্গে। সে ভাবে তার পরিবার কেমন ছিল, তার বাবা মা কারা ছিলেন, তার কোন ভাইবোন ছিল কিনা... ফাদার তাকে বলেছেন ঈশ্বরপুত্র যিশু যেমন সবার পিতা, তেমন তারো পিতা। চারিপাশের জীব -জন্তু মানুষ সবাইকে ভালবাসতে হবে, তাহলেই যিশুকে

ভালবাসা হবে। ঈশ্বরের ভালবাসা পেতে হলে কোন কঠিন তপস্যার প্রয়োজন নেই, চাই শুধু নিঃস্বার্থ ভাবে নিজের কাজ করে যাওয়া।

দিন যায়, শরত গিয়ে হেমন্ত আসে, নিস্তরঙ্গ জীবনে মাঝে মাঝে এখানে ওখানে ছোট ছোট ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ঢেউ ওঠে। হেমন্ত ও চলে যায়, আসে শীত। সন্ধ্যের আগেই অন্ধকার নেমে আসে। অন্ধকার যত গাঢ় হয়, শীত ও যেন জাঁকিয়ে বসে তত। দেখতে দেখতে খ্রিসমাস এসে গেল। ফাদার হিল্ডাকে এক নতুন দায়িত্ব দেন খ্রিসমাস এর জন্য গীর্জা সাজানোর।

স্কুলের বাগানের চারাগাছগুলো ভরে ওঠে নানারকম মরসুমি ফুলে। হঠাত হিল্ডার গতিবিধি যেন পালটে যায়। এখন হাঁটলে তার পায়ের শব্দ পাওয়া যায়, পোষাকে আশাকে যেন একটা উজ্জ্বলতার ছোঁয়া। হাতে নানা জিনিষ পত্র নিয়ে সে ফাদারের ঘরে দিনে কতবার যে আসাযাওয়া করে, তার হিসাব থাকে না। এখন আর সে জানলায় দাঁড়িয়ে থাকে না।

আজ খ্রিসমাস ইভ, কাল খ্রিসমাস ডে। স্কুলের পেছন দিকের ছায়া ঘেরা বনপথ দিয়ে ফাদার, স্কুলের শিক্ষকেরা, আর ছেলেমেয়েরা গীর্জায় আসে। দূর থেকে দেখা যায় দরজায় দরজায় প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে আলোর মালা যেন। মোম জ্বেলে আলোকময় করে তোলা হয়েছে চারদিক। সব দীপ জ্বালিয়েছে হিল্ডা। নিজের হাতে হিল্ডা তৈরি করেছে নানা জিনিস, আর অনেকগুলি ছোট চ্যাপেল। চ্যাপেলগুলিতে আছে পরমপিতা যিশুর জীবনের সমস্ত ঘটনার বর্ণনা। হিল্ডার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ফাদার দেখলেন, হিল্ডা তেমনি নীরবে দাঁড়িয়ে আছে, শুধু মুখের উপর থেকে সরে গেছে সেই বিষাদের আবরন, আলোয় উদ্ভাসিত তার শান্ত মুখে যেন লেগে আছে একটুখানি মুক্তির হাসি। ফাদার বুঝলেন ঈশ্বরের কাজের মাঝে থেকেই হিল্ডা আজ অনুভব করেছে ঈশ্বরের ভালবাসা।

ই-আই-আর লাইনে ইঞ্জিন যাচ্ছে ধস ধস করে। অন্ধকারে ধোঁয়ার কোন আভাস ই দেখা যায়না। দেখা যায় শুধু শত শত মোমের আলোর রোশনি। সেই আলোয় সবার ই মুখ যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ফাদার, হিল্ডা আর গীর্জায় আসা অনেক মানুষের।

ছন্দা দে
রূপনারায়ণপুর

আনমনে: আমার ছোট্টবেলাঃ পর্ব ১

[পূর্বতন পূর্ববঙ্গ, এখনকার বাংলাদেশের স্মৃতিকথা]

প্রতিদিন সকালে কে তোমার ঘুম ভাঙায়? আমি কিন্তু জানি। হয় তোমার মা অথবা বাবা, আর নাহয় অ্যালার্ম ঘড়ি। তিড়িং করে এক লাফে উঠে পড়তে হয়। উঠতে গড়িমসি করে দেরি করলেই ভারি বিপদ। স্কুলের গাড়িটা চলে যায় যদি হুশ করে!

আমার ঘুম কে ভাঙাতো বলতে পার? একটা ঘুঘুপাখি। ছোটবেলায় থাকতাম মামার বাড়ীতে। রাতে শুতাম "দিয়ানি"র কাছে। দিয়ানি কথাটা কখনো শোননি তো? আমি ই কি জানতাম তখন! আসলে দিদিমা কে ডাকতাম দিদিমনি বলে। অতবড় একটা কথা তাড়াতাড়ি তে হয়ে যেত "দিয়ানি"। সেটাই চালু হয়ে গেছিল আর কি...

ঘরের টিনের চালের ওপর রোজ বসত ঘুঘুটা আর ডাকাডাকি করত। একদিন দিয়ানি কে জিজ্ঞেস করলাম - "ও ওরকম সুর করে এক ই ভাবে ডাকছে কেন?"

দিয়ানি বললেন "ও তোমাকে উঠতে বলছে। বলছে গোপাল ঠাকুর ওঠো, ওঠো! তুমি তো আমার গোপাল ঠাকুর, তাই ওরকম বলছে।" একটু থেমে আবার বললেন," তাই বলে এখনি উঠনা কিন্তু, সকাল হয়নি এখনো।" সেই থেকে ঘুম ভাঙলেও ওঠা বারন ছিল সকাল হবার আগে। আমার তো মজাই হল। আধ ঘুমে, আধ জাগার মাঝে শুয়ে থাকার যে কি আনন্দ সে আর কি বলব!

প্রতিদিন তোমরা ঘুম থেকে উঠে স্কুল যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে শুরু কর। কিন্তু আমার ছিল অন্য রকম কাজ। ঘুম থেকে উঠে হাতমুখ ধুয়ে আমায় যে কাজটা করতে হত রোজ, সেটা শুনলে নিশ্চয় আঁতকে উঠে নাক শিঁটকে বলে উঠবে "অ্যাহ!"

বাগানে ঘুরে ঘুরে কতকগুলো গাছের পাতা জোগাড় করতে হত রোজ। এগুল হল আনারসের কচি পাতা, শিউলির মোটা পাতা; এছাড়াও ছিল আরো কতকগুলো তেতো তেতো পাতা। সেসব দিয়ানি

শিলে থেঁতো করে তেতো রস বার করতেন। আর আমাদের সব ভাই বোনেদের এক ঝিনুক করে গিলতে হত সোনামুখ করে। মুখ দিয়ে আওয়াজ বেরতো "অ্যাহ!"

এর পর দাদুর কাছে বসতে হত বর্ণপরিচয় আর স্লেট পেন্সিল নিয়ে। সে স্লেট তোমরা দেখনি। পাথরের তৈরি বড্ড ভারী ছিল সেই স্লেট। কিন্তু কি আর করার ছিল বল- তখন তো বাচ্চাদের হাতে প্রথমেই খাতা কলম দেওয়া হত না লেখা শেখার জন্য! স্লেট এ দাদু "অ" "আ" ইত্যাদি লিখে দিতেন আর আমাকে সেই লেখার ওপর হাত বোলাতে হত।

এসব হতে হতেই দিয়ানি ডাক দিতেন সকালের জলখাবার খাওয়ার জন্য। কি খেতাম জানো? সুগন্ধি চালের মিঠে মিঠে ফেনা ভাত, মটর ডালের বড়ি সেদ্ধ, আর আলু সেদ্ধ দিয়ে। খাওনি বোধ হয় কখনো, তাই না? হয়ত বলবে "এমা, এ আবার কিরকম সকালের খাবার?"

খেলে বুঝতে ব্যাপারখানা কি!!

[চলবে]

সন্তোষ কুমার রায়
রূপনারায়ণপুর

পড়ে পাওয়া: হে অরণ্য কথা কও

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সবাইপুরের কাছে এসে ইছামতীর তীরের সৌন্দর্য আরও রহস্যময় হয়ে উঠলো। যেন তীরভূমির এই প্রাচীন অশ্বত্থ গাছটা, ওই প্রাচীন ষাঁড়া গাছগুলো আমায় চেনে আমার বাল্যকাল থেকে,যেন এখনি বলবে- এই দ্যাখো সেই খোকা কত বড় হয়েছে! সবাইপুরের বাঁক ছাড়িয়ে অদূরে কাঁচিকাটার খেয়ায় কারা পার হচ্চে। একটি ছোকরা,সঙ্গে একটি প্রৌঢ়া, দুটি ছেলেমেয়ে,একখানা সাইকেল। ছোকরা বললে, আশুরহাটে তাদের বাড়ী। পাশেই মরগাঙের খাল, বহুদিন পরে আমি ঢুকলাম নৌকো করে এই খালের মধ্যে। ছোট একটা বাঁশের পুলের তলা দিয়ে বাঁ ধারে আরামডাঙার বাঁশবন, খেজুরবাগানের তলা দিয়ে ওই গ্রামের একটা ঘাটে পৌঁছুই। ছোট্ট খালের এই ঘাটটি ঠিক যেন একটি ছবি। ছায়া নিবিড় স্নিগ্ধ অপরাহ্ন,নীল আকাশ,ঘন সবুজ জলজ ঘাস ও দুর্বাস্তৃত তৃণক্ষেত্র-সামনে কতকগুলি প্রাচীন গাছের আধ অন্ধকার তলায় একটা পুরোনো ইটের দরগা। কতকাল এদিকে আসিনি,আমারই গ্রামের পেছনে আরামডাঙার এই ঘাট কখনো দেখেছি বলে মনে হয় না-হয়তো কখনো আসিই নি-অথচ কোথায় লিপুদারায় সেই বন্য সরোবর,ভালকীর সেই ঘন অরণ্য, মানভূমের মাঠাবুরু শৈলশ্রেণী,বামিয়াবুরু ও চিটিমিটি, রাঁচির পথে হির্নি জলপ্রপাত, ও পোড়াহাট রিজার্ভ ফরেস্ট। কোথায় দিল্লী,কোথায় আগ্রা, কোথায় চাঁট গাঁ,কোথায় শিলং,দার্জিলিং কোথায় না গিয়েচি! অথচ জীবনে কখনো আসিনি আমার গ্রাম থেকে মাত্র দুমাইল দূর আরামডাঙার এই ছবিটির মতো সুন্দর,তীরতরু শ্রেণীর নিবিড় ছায়াতলে অবস্থিত প্রাচীন পীরের দরগা ও ছোট্ট ঘাটটিতে।...

পড়ে পাওয়া বিভাগে আমরা আমাদের পছন্দের লেখক বা মনিষীদের লেখা থেকে বা তাঁদের জীবনের কিছু টুকরো তুলে ধরব। তোমার পছন্দের লেখক কে? তুমি কি তাঁর ছোটবেলা সম্বন্ধে কোন গল্প জানো? জানলে লিখে পাঠাও আমাদের। আমরা সবাই মিলে সেই লেখা পড়ব। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়র লেখা কোন বই তুমি কি পড়েছ? তাহলে লিখে জানাও আমাদের কেমন লেগেছে সেই বই।

গত সংখ্যায় পেয়েছি: জসীম উদ্দীন

বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে আবার অনেকের মতে অম্বিকাপুরে ১৯০৪ সালের ১ জানুয়ারী জসীমউদ্দীনের জন্ম হয়। তাঁর পিতা শিক্ষাব্রতী মৌলবী আনসার উদ্দীন। আর মা আমিনা খাতুন। গ্রামের পাঠশালায় পড়াশোনা শুরু হয় ছোট্ট জসীমউদ্দীনের। অনেক কষ্ট করে পড়াশোনা করেছেন তিনি। তাঁর জীবন কথা পড়লে সে সব জানা যায়। ফরিদপুর হিতৈষী স্কুলে পড়া শেষ করে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে ১৯২৭ সালে আই.এ এবং ওই কলেজ থেকে ১৯২৯ সালে বি.এ পাশ করেন। ১৯৩১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ পাশ করেন।

হুড়হুড় করে সাল,তারিখ দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সব লিখে ফেললাম পড়াশোনার জীবনটা ছোট্ট জসী এমনকি বড় জসীম উদ্দীনের কাছে ততটা সহজ ছিল না। গ্রাম থেকে শহরে আসার প্রতিটা পদক্ষেপে কষ্ট ছিল, দারিদ্র ছিল, আর ছিল কিছু হিংসুটে মানুষের দস্যিপানা। কিন্তু এইসব তুচ্ছ জসীম উদ্দীনের জেদের কাছে। সেই গ্রামের রাখাল যে একদিন তারই গ্রামের কথা জানাবে সারা বিশ্বকে। বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে যে সুর তার মধ্যে রিনিরিনি ঝুম-ঝুম বাজবে...উঠোন ভরা থাকবে পাকা ধানে...নক্সীকাঁথাটি মেলে গুনগুন করে গান ধরবে দাদি। আর জসীমউদ্দীনের সোনার কলমে ঝরে পড়বে - রাখাল ছেলে রাখাল ছেলে বারেক ফিরে চাও/বাঁকা গাঁয়ের পথটি বেয়ে কোথায় চলে যাও?

১৯৩৭ থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ১৯৭২ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডিলিট উপাধি দেয়। জসীমউদ্দীনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ রাখালী(১৯২৭) এরপর একে একে প্রকাশিত হতে থাকে-নক্সীকাঁথার মাঠ,বালুচর,দুরাশা, ধানক্ষেত,সোজনবাদিয়ার ঘাট হাসু ইত্যাদি। ভাষা আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে "একুশের পদক" পেয়েছিলেন।

১৯৭৬ সালের ১৪ মার্চ বাংলার এই প্রিয় কবির মৃত্যু হয়। জসীমউদ্দীনের ইচ্ছানুযায়ী তাঁর দাদির কবরের পাশেই তাঁকে সমাহিত করা হয়। জসীম উদ্দীন রয়েছেন আমাদের ভাষায়...আমাদের বাংলায়...আমাদের চেতনায়...আমাদের অন্তরে অন্তরে।

কল্লোল লাহিড়ী
কলকাতা

গত সংখ্যায় আমরা পড়েছিলাম জসীম উদ্দীন এর লেখা "জীবন কথা"র একটু অংশ।

মনের মানুষ: ওবিন ঠাকুর ছবি লেখে

প্রায় একশো বছর আগের কথা। একজন তরুন শিল্পী ছিলেন। খুব ভাল ছবি আঁকতেন আরে মূর্তি গড়তেন। তাঁর আঁকা ছবির কদর করত দেশ - বিদেশের সবাই। তিনি আবার ছবি আঁকতেও শেখাতেন। সেই সময়ে সবাই যখন ইউরোপের ধাঁচে ছবি আঁকছে, তখন তিনি ভারতের নিজস্ব মুঘল ও রাজপুত ধাঁচের ছবি এঁকে এই শিল্পের এক নতুন দিক তুলে ধরেন।

একদিন এই শিল্পীকে তাঁর কাকা, যিনি একাধারে কবি এবং লেখক ছিলেন, ডেকে বললেন ছোটদের জন্য গল্প লিখতে। শিল্পী তো অবাক!! তিনি তো ছবি আঁকেন। রঙ -বেরং এর তুলির টানে ভরিয়ে তোলেন ক্যানভাস। তিনি গল্প লিখবেন কি করে? কাকা তাঁকে অভয় দিয়ে বললেন, যেমন করে গল্প কর, সেরকম করেই লেখ। লেখা হল প্রথম গল্প 'শকুন্তলা'। কন্ব মুনির আশ্রমে বড় হয়ে ওঠা সুন্দরী শকুন্তলা আর রাজা দুষ্মন্ত এর গল্প। সে যে কি সুন্দর গল্প - পড়তে পড়তে মনে হবে তুমি যেন কন্ব মুনির আশ্রমেই আছ! কাকা বলেছিলেন যদি প্রয়োজন হয় তাহলে ভাষা শুধরে দেবেন। কিন্তু একটা শব্দ ও বদল করতে হয়নি। বলতো কার কথা বলছি? - বলছি আমাদের প্রিয় লেখক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা। আর সেই কাকা কে ছিলেন জান? - কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

'শকুন্তলা', 'ক্ষীরের পুতুল', 'নালক', 'রাজকাহিনী', 'বুড়ো-আংলা', আরো কত কত গল্প, ছড়া, নাটক, তিনি লিখেছেন ছোটদের জন্য।তাঁর ভাষা সহজ, সরল, পড়ে বুঝতে একটু ও অসুবিধা হয়না। আর গল্পের মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠে কি সুন্দর সব ছবি। সে 'ক্ষীরের পুতুল' গল্পে দিগনগরের দীঘির ঘাট ই হোক, বা 'রাজকাহিনী'র রাজপুত রাজা-রানীদের সাহস আর বীরত্বের গল্পই হোক - সব যেন চোখের সামনে ভাসতে থাকে। অবনীন্দ্রনাথ খুব সহজেই ছুঁতে পারতেন ছোটদের মনকে। সেইজন্যই তো তিনি কত সহজে ফুটিয়ে তুলতে পারেন ছোট্ট রাজপুত্র গায়েব এর বাবার পরিচয় না থাকার কষ্ট; রাজকুমার বাপ্পাদিত্যের ভীল বালকদের সাথে বন্ধুত্বের গল্প।

আর 'বুড়ো-আংলা'র রিদয়! - তার মত দুষ্ট ছেলে আর দুটো আছে নাকি? সে এত দুষ্ট যে গনেশ ঠাকুর রেগেমেগে তাকে আঙ্গুল সমান বুড়ো-আংলা বানিয়ে দিলেন। বেচারা রিদয় তখন বুনো হাঁসেদের পিঠে চেপে উড়ে চলল কৈলাশ পর্বতের দিকে, গনেশ ঠাকুরের কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য। উড়তে উড়তে রিদয় দেখতে পেল নিচে রঙিন নকশী কাঁথার মত বিছানো সুন্দর বাংলা দেশ। সেই ছবির মত

বিবরণ জানতে হলে অবশ্যই পড়ে ফেলতে হবে 'বুড়ো-আংলা'।

অবনীন্দ্রনাথ নিজেও বোধ হয় জানতেন যে তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠে রঙিন ছবির টুকরো। তাই তো, 'বুড়ো-আংলা' গল্পে হাঁসের দল উড়তে উড়তে যখন প্রতিটি গ্রাম- শহর-মাঠ - জঙ্গলের খবর নিচ্ছে কুঁকড়োদের কাছ থেকে, তখন তারা হাঁকে -

"কার বাড়ি?"
"ঠাকুর বাড়ি।"

"কোন ঠাকুর?"
"ওবিন ঠাকুর -ছবি লেখে।"

মহাশ্বেতা রায়
কলকাতা

দেশে-বিদেশে

হারবিন

চিনের উত্তর-পুর্বে রাশিয়ার গায়ে গা লাগিয়ে রাজহাঁসের মতো আকারের একটা প্রভিন্স যার নাম হেইলংজিয়ান (heilongjian) । হারবিন সেই রাজহাঁসের গলায় যেন একটা উজ্জ্বল মুক্ত - মধ্যমনি শহর। সংহুয়া নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত এই শহরটিকে বলা হয় 'আইস সিটি' বা 'বরফের শহর'। 'হারবিন' কথাটার আঞ্চলিক মানে 'মাছ ধরার জাল শুকানোর জায়গা'।

বছরের অর্ধেক সময় এই শহরের তাপমাত্রা থাকে শূন্যের নীচে। শীতকালে এই শহর ঢেকে থাকে তুষারে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা পৌঁছয় -৪০ ডিগ্রী সেলসিয়াসে। পাশের সংহুয়া নদীর জল জমে বরফ হয়ে যায়। সেই বরফ আর তুষার কাজে লাগিয়ে তৈরী হয় নিপুন ভাস্কর্য। সারা পৃথিবীর নানা দেশ থেকে নামী দামী দক্ষ শিল্পী ও ভাস্কররা ভাস্কর্য তৈরী করতে উপস্থিত হন এখানে। নদীর বুক জুড়ে মুক্তাঙ্গন মেলা বসে। নানা জায়গায় শুরু হয় বরফ আর তুষারের চোখধাঁধানো ভাস্কর্য প্রদর্শনী - 'আইস এন্ড স্নো ফেস্টিভ্যাল'।

উপরের সব কটি ছবিতে মূর্তি এবং বাড়িটি বরফ দিয়ে তৈরি

বরফ আর তুষার দিয়ে তৈরী করা হয় অসংখ্য সুন্দর সুন্দর বাড়ি, মূর্তি, পৃথিবীর নানা বিখ্যাত স্থাপত্যের প্রতিলিপি। এমনকি পায়ে চলা রাস্তা আর প্রাচীরও তৈরী করা হয় বরফ দিয়ে। বরফের ভেতরে নানা রঙের উজ্জ্বল চকচকে আলো দিয়ে সুন্দর করে সাজানো থাকে। অন্ধকার রাত্রে সেই দৃশ্য দেখার মতো।

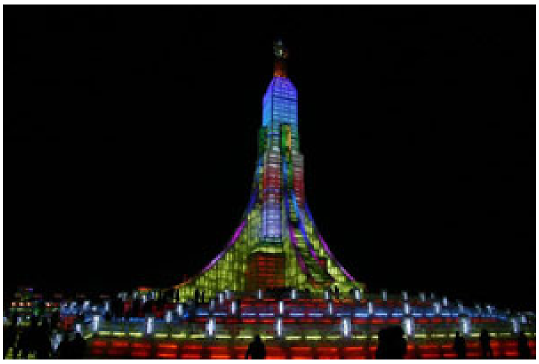

রাতের আঁধারে আলোয় সাজানো বরফের তৈরি স্থাপত্য

এই প্রদর্শনী দেখতে দেশ বিদেশ থেকে হাজার হাজার দর্শনার্থীর ভীড় হয়। প্রদর্শনী ছাড়াও নানা আইস স্পোর্টস শুরু হয় এই সময়। হয় নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কিছু মানুষ নদীর ওপর বরফ কেটে সেই বরফ গলা জলে স্নান করে। কুকুরে টানা স্লেজ ও ঘোড়ায় টানা নানান গাড়ি চেপে ঘোরা যায় নদীর বরফে।

বরফে ঢাকা নদী

হারবিনের আর এক অন্যতম আকর্ষন সাইবেরিয়ান ব্যাঘ্র পার্ক। সাইবেরিয়ান বাঘ এখন বিলুপ্তপ্রায়। তাই তাদের বাঁচিয়ে রাখার এমন প্রচেষ্ঠা। প্রায় ৩৫৬ একর জায়গা জুড়ে তৈরী এই পার্কে পাঁচশ-র

বেশি বাঘ আছে।

সাইবেরিয়ান বাঘ

বাঘ ছাড়াও দেখা মেলে কিছু সিংহ, লেপার্ড, পুমা এমন কি রয়েল বেঙ্গল টাইগারের। ইকোট্যুরিজিমের সৌজন্যে দর্শনার্থীদের গাড়িতে করে ঘোরান হয় পার্কে – বাঘেদের কে খুব কাছ থেকে দেখতে পাওয়ার বিরল সৌভাগ্য মেলে। দর্শনার্থীদের জন্যে আলাদা করে কিছু ভিউইং গ্যালারী করা আছে। সেখান থেকে যে কেউ বাঘদের মাংস খেতে দিতে পারে নিজে হাতে। বাঘদের শিকার করা দেখার ইচ্ছে করলে জ্যান্ত মুর্গী কিনে ছুঁড়ে দিতে পারে বাঘেদের মাঝে।

১৯০৭ সালে রাশিয়ানদের তৈরী কাঠের ১৭৫ ফুট লম্বা সেন্ট সোফিয়া চার্চটাও অসাধারন সুন্দর।

সেন্ট সোফিয়া চার্চ

'সেন্ট সোফিয়া' কথাটার মানে ভগবানের wisdom। চার্চটা দেখলে মনে হবে সত্যিই ভগবানের হাতের তৈরী।

লেখা ও ছবি -
রুচিরা
বেইজিং

ইয়েলোস্টোন ন্যাশানাল পার্ক

সামনের জমি থেকে প্রচুর ধোঁয়া উঠছে। কোনো কোনো গর্ত থেকে হিস্‌হিস্‌ গরম জল বেরিয়ে আসছে। জল এত গরম যে কাছাকাছি গেলে গরম হল্কা টের পাওয়া যাচ্ছে। অন্যদিকে তাকালে জল ফোয়ারা হয়ে বেরিয়ে আসছে। কোনো ফোয়ারাটা এতো জোরে মাটি থেকে বেরোচ্ছে যে ফোয়ারার জল কুড়ি থেক তিরিশ তলা উঁচু বাড়ি ছাড়িয়ে চলে যাবে। জায়গাটার নাম ইয়েলোস্টোন ন্যাশানাল পার্ক। আমেরিকার ওয়াইওমিং রাজ্যের পশ্চিম কোণে। আমরা গাড়ি থামিয়ে, সামনের মাঠটার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

সন্ধ্যে নেমে আসছে। গাড়ি নিয়ে আমরা ধীরে ধীরে এগোতে থাকলাম আমদের হোটেলের দিকে যেখানে আমরা রাত কাটাবো। যাবার পথে একদিকে দেখি মাঠের মধ্যে মোটা মোটা বাইসন ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাইসনগুলো ঘুরে ঘুরে ঘাস খাচ্ছে আবার মাঝে মাঝে মাটিতে জোরে জোরে খুর ঠুকছে। আর তখন চারপাশ ধুলোয় ভরে যাচ্ছে। বাইসনকে দেখতে শান্ত, নিরিহ মতো। কিন্তু মুখটা গম্ভীর যেন বলে দিচ্ছে-আমাকে ঘাঁটিও না। অবশ্য তার সিং ও চেহারা দেখলে ঘাঁটানোর সাহস হবে না। বাইসন নিয়ে একটা মজার ঘটনা আছে পরে বলছি। এই বাইসনটা রাস্তার ধার ধরে হাঁটছিলো।

রোদ পড়ে এসেছে,সময়টা অগষ্ট মাস। এই সময়ে রোদ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হঠাত চারিদিক অন্ধকার হয়ে যায়। তাই আবার আমরা রওনা দিলাম। সামনে একটা উঁচু পাহাড়। সেটা পেরোলেই আমাদের হোটেল। গাড়িটা পাহাড়ের কাছাকাছি আসতেই দেখতে পেলাম সামনে উঁচু পাহাড়টার ওপরে কিছু নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে। বাইনাকুলারটা চোখে লাগিয়ে দেখতে পেলাম-হরিণ,প্রচুর হরিণ। এতো হরিণ আগে কখোনো দেখিনি। বাচ্চা হরিণ, শিংওলা হরিণ, শিং বিহীন হরিণ সবাই মিলে দঙ্গল বেঁধে পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে খাবার খাচ্ছে। আর একটু কাছে যাবার পর খালি চোখে দেখা গেলো। ছবি তোলার চেষ্টা করলাম কিন্তু অন্ধকার হয়ে গেছে বলে আর ছবি তোলা গেল না। আমরা এগিয়ে চললাম আমাদের হোটেলের দিকে।

অন্ধকার নেমে আসলো। এতো অন্ধকার যে এক হাত দূরের জিনিষ দেখা যায় না। শুধু চারিদিকে মাটি থেকে হিসহিস করে গরম জল ওঠার শব্দ শোনা যায়। কান পাতলে মনে হবে কারা যেন ফিসফিস করে কথা বলছে। সেই অন্ধকারে গা ছমছম করে ওঠে। হোটেলের বাইরে আলো ছাড়া ঘুরতে যাওয়া নিরাপদ নয়। আমরা রাতের খাবার খেয়ে গল্প করতে করতে ঘুমোনোর চেষ্টা করলাম। রাতে আমি একটা স্বপ্ন দেখলাম...আমি যেন এক স্বপ্নের দেশে চলে গেছি। রূপকথার রাজপুত্রের মতো আমাকেও তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে হবে। সামনে ধোঁয়া ভরা মাঠ। বাইসনগুলো চোখে চোখে রাখছে। আমাকে বাইসনের মধ্যে দিয়ে ফুটন্ত গরম ফোয়ারার মধ্যে দিয়ে মাঠ পেরোতে হবে। আমি হাঁটবো না দৌড়াবো ঠিক করতে পারছি না। হঠাত বাইসনগুলো হেসে বললো ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এ কোন জায়গায় এলাম যেখানে বাইসন কথা বলে!

পরের দিন সকালে উঠে প্রথমেই যেটা চোখে পড়লো সেতা এই নীচের ছবিটার মতো। নাম জানলাম ফিউমারোল [fumarole]। জায়গাটা দেখে মনে হলো এ কোন জায়গায় এসে পড়লাম রে বাবা।

এখানে মাটি এতো গরম যে জল বাষ্প হয়ে আকাশে উড়ে যাচ্ছে। বাষ্প আর অন্যান্য গ্যাস বেরিয়ে আসছে ওপরের ছবিটাতে। চারিদিকে একটা তীব্র রাসায়নিক রাসায়নিক গন্ধ। কাছাকাছি আরো অনেক জিনিষ দেখলাম ও জানলাম যা আগে কখোনো দেখিনি। নাম জানলাম গীজার (geyser) – উষ্ণ প্রস্রবণ এবং মাডপট। নীচের ছবিটা ওল্ড ফেইথফুল গীজারের। ইয়েলোস্টোন ন্যাশানাল পার্ক সবচেয়ে জনপ্রিয় দেখার স্থান।

জলটা ১৮০ থেকে ১৯০ ফুট উঠে যায়। প্রত্যেক ৯০ মিনিট অন্তর এই গীজার টা থেকে গরম জল ফোয়ারা হয়ে বেরিয়ে আসছে। ৯০ মিনিট অন্তর ফোয়ারার জল আসে বলে একে পুরোনো বিশ্বস্ত (old faithful) বলে। একদম ঘড়ির কাঁটা ধরে মেলানো যাবে।

জায়গাটা রূপকথার দেশ। প্রত্যেক পদে পদে নতুন জিনিষ দেখার,নতুন জিনিষ জানার। ইয়েলোস্টোন পার্কে পৃথিবীর সবচেয়ে জিওথার্মাল বিষয়ক জিনিষ দেখার আছে। আমি ভারতে বেশি জায়গা ঘোরার সুযোগ পাইনি। তোমাদের জানা যদি কোনো জায়গায় তোমরা এই ধরনের জিনিষ দেখে থাকো তাহলে আমাকে জানিও। পরেরবার ভারত গেলে আমি সেখানে বেড়াতে যাবো।

জায়গাটাতে বন্য জন্তু আছে অনেক। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো ভাল্লুক। আমরা ভাল্লুক দেখতে পেয়েছি। এটা চিড়িয়াখানার ভাল্লুক নয়। তাই কখোনো ভাল্লুক দেখা যায়,আবার কখোনো দেখা যায় না। গ্রিজলি ভাল্লুক আর কালো ভাল্লুক দুটোই আছে এখানে। আমাদের

ভাগ্য খুব ভালো ছিলো, দুধরনের ভাল্লুক দেখতে পেয়েছিলাম। কিন্তু তারা এতোটাই দূরে আছে আর আমার কাছে দূরের ছবি তোলার লেন্স ছিলো না। নীচের দুটো ছবি ইয়োলোস্টোন ন্যাশানাল পার্কের ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া। ছবি গুলি সবার ব্যবহারের জন্য অনুমতি প্রাপ্ত।

নীচের ছবিটা কালো ভাল্লুকের। গায়ের রঙ কালো। আর পিঠে কোনো কুঁজ নেই।

এটা গ্রিজলি ভাল্লুকের ছবি। এর পিঠে বড় কুঁজ আছে। এই কুঁজ দেখে বোঝা যায় কোনটা গ্রিজলি আর কোনটা ব্ল্যাক বা কালো ভাল্লুক। দুজনেই কিন্তু সমান ভাবে ভয়ঙ্কর।

এবারে বাইসনের মজার গল্পটা বলে আমার লেখা শেষ করি। সকালবেলা বেরিয়ে ভাল্লুক, হরিণ, এল্ক এইসব বন্য জন্তু দেখে আমদের মনটা বেশ খুশি খুশি। আমি ড্রাইভ করছিলাম আর আমার পাশে আমার বউ পিউ বসেছিলো হাতে ক্যামেরা নিয়ে। একটা জায়গায় এসে রাস্তা দু দিকে ভাগ হয়ে গেছে। আমি বাঁ দিকের রাস্তাটা নিলাম। গাড়ি ঘোরাতে সামনে অবাক হবার পালা। রাস্তা জুড়ে বাইসনের দল। আমাদের যাবার জায়গা নেই। তাই আমরা গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে দাঁড়িয়ে গেলাম। বাইসনের দলটা আমাদের থেকে ২০-৩০ ফুট দূরে। আমাদের আগে বা পেছনে কোনো গাড়ি নেই।

এইভাবে পাঁচ মিনিট কাটলো। বাইসনের দল নড়ার কোনো ইচ্ছা দেখাচ্ছে না। আমরা ভাবছি হর্ণ বাজাবো কিনা। আবার হর্ণ বাজালে আমাদের গাড়ির দিকে যদি ছুটে আসে! কি করবো ঠিক রতে পারছি না।

এমন সময় একটা বাইসন দলছুট হয়ে আমাদের গাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করলো। আমাদের গাড়ির দিকে বাইসনের হাঁটার গতি যত বেড়ে যাচ্ছে ততই আমাদের বুকের ভেতর জোরে জোরে ড্রাম বাজতে

শুরু করেছে। গাড়ি ঘোরানোর জায়গা নেই। আমি ফিসফিস করে পিউকে বললাম, ছবি তোলো...ছবি তোলো। তিন-চারবার বলার পর পিউয়ের ছবি তোলার কোনো আওয়াজ পাচ্ছি না বলে পিউয়ের দিকে তাকিয়ে দেখি পিউ ক্যামেরা অন করার চেষ্টা করছে কিন্তু হাত কাঁপার জন্য ক্যামেরা অন আর হচ্ছে না। আমিও ভয়ে কাঠ হয়ে আছি। আমার গা,হাত,পা সব অবশ। বাইসনটা পাঁচ-ছয় ফুট দূরে চলে এসেছে। এরমধ্যে সে তার হাঁটার দিক পরিবর্তন করেনি, সোজা আমাদের গাড়ির দিকেই আসছে। আরো কাছে চলে এসেছে। আমি চোখ বন্ধ করে রইলাম। যে কোনো মুহূর্তে সংঘর্ষ হবে। কোনো আওয়াজ না পেয়ে সাহস করে চোখ খুলে দেখি বাইসনটা মাত্র দু ফুট দূরে। হঠাত বাইসন হাঁটার দিক পরিবর্তন করলো। বাঁদিকে ঘুরে গিয়ে আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

বাইসন আমাদের ফেলে চলে গেলে আমরা আবার নিশ্বাস নিতে নিতে পারলাম। পরে জানতে পেরেছিলাম বাইসনের দৃষ্টি শক্তি তেমন প্রখর হয় না। তাই দূরের কিছু দেখতে পায় না। বাইসনটা আমাদের তাড়া করেনি, হয়তো আমাদের দেখতেও পায়নি। কাছে এসে গাড়িটা দেখে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। আমরা ভয়ে নড়তে পারছিলাম না। এখন হাসি পায়, কিন্তু সেই মুহূর্তে আমরা ভয়ে মরে যাচ্ছিলাম।

জায়গাটাতে বন্য জন্তু ছাড়াও আরো অনেক কিছু দেখার আছে। ভূপ্রাকৃতিক জিনিষ যেমন জলপ্রপাত, ক্যানিয়ন আছে। ইয়োলোস্টোনে গোটা পৃথিবীর অর্দ্ধেক জিওথার্মাল দ্রষ্টব্য জিনিষ আছে। পার্কে আমেরিকান রেড ইন্ডিয়ানদের বাস করার নিদর্শন আছে। সেটা নিয়ে অন্য একদিন গল্প করা যাবে। বিশদ বিবরণ দেওয়া আছে পার্কের ওয়েব সাইটে(http://www.nps.gov/yell/index.htm)

আগামী সংখ্যাতে আমি এমন একটা জায়গা নিয়ে লিখবো যেখানে অনেক ধরনের টিয়া পাখি আছে। সে এক মজার জায়গা। এই লেখাটা পড়ে তোমাদের প্রশ্ন থাকলে জানিও। আর অবশ্যই জানিও কেমন লাগলো। ভালো থেকো সবাই।

লেখা ও ছবি-
দেবাশিস পাল
ওকলাহোমা সিটি

ছবির খবর: ছবির উতসব

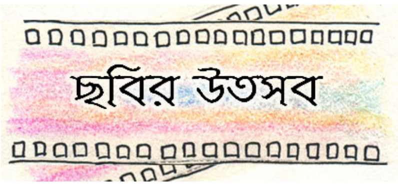

ছোট্ট মেয়ে সাসলায়া আর তার মূক ভাই দারিও থাকে নিকারাগুয়ার কোন এক শহরে। জঞ্জালের ঢিপি থেকে জঞ্জাল কুড়ানোর ফাঁকে ইশকুলেও যায় দুজনে। থাকে জঞ্জালের ঢিপির পাশে একটা ভাঙাচোরা আস্তানায় দাদুর সাথে। কিন্তু মাকে ছেড়ে থাকতে ভালো লাগে না যে! তাই দুইজনে মাকে খুঁজতে পাড়ি দেয় পাশের দেশ কোস্টারিকায়। শহর পেরিয়ে, অনেক পথ ঘুরে, একটা জাহাজে চেপে অন্য অনেক মানুষের সঙ্গে কোস্টারিকার সীমান্তে জঙ্গলে পৌঁছায় তারা। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে হঠাত শুরু হয় প্রহরীদের টহলদারি। ছিটকে যায় দুই ভাই বোন। সাসলায়া আর ভাইকে খুঁজে পায়না। ক্লান্ত পায়ে এক নতুন শহরে পৌঁছায় সে। ভাইকে খুঁজতে খুঁজতে সেই শহরের ভীড়ে হারিয়ে যায় ছোট্ট সাসলায়া।

এই গল্প নিয়েই ছবি বানিয়েছেন কোস্টারিকার চলচ্চিত্র পরিচালক ইশতার ইয়াসিন গুতিয়েরেজ। ছবির নাম " এল কামিনো"। তৈরী হয়েছে ২০০৭ সালে। ভাবছ এই দূর বিদেশের ছবি আমি দেখলাম কি করে? আমি এই ছবি দেখলাম "চতুর্দশ কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উতসবে।" তুমি কি কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উতসবের নাম শুনেছ? সে এক দারুণ জমজমাট ব্যাপার। প্রতি বছর ১০ -১৭ ই নভেম্বর কলকাতায় এই উতসব হয়। ২০০৮ সালে এই উতসব ১৪ বছরে পা দিল।

কলকাতার বিভিন্ন সিনেমা হলে দেখান হয় দেশ- বিদেশের কয়েকশো ছবি ও তথ্যচিত্র। বেশ কিছু ছোটদের ছবিও দেখানো হয়। কয়েকটি হলে বিনামুল্যে প্রবেশপত্র ও পাওয়া যায়। এ কিন্তু এক অন্য রকম অভিজ্ঞতা। অজানা ভাষার ছবি হলে আবার ছবি দেখার সাথে সাথে তার ইংরাজি সাবটাইটেল পড়াও অভ্যেস করতে হয়।

এইরকম উতসব দেখলে কি হয় বলতো? কত দেশের কত রকমের গল্প, নানা রকম মানুষের জীবনের নানা রকম ঘটনা- দেখে, জেনে, মনের জানালা টা অনেক বড় হয়ে যায়। এ যেন ঠিক একটা নতুন বিদেশী গল্পের বই পড়ার আনন্দ! এইরকম চলচ্চিত্র উতসব কিন্তু শুধু কলকাতায়ই হয়না। ভারতের বেশ কয়েকটা বড় শহরে এবং দেশ বিদেশের বিভিন্ন শহরে এইরকম উতসব সারা বছর ধরেই হয়। ভারতের দক্ষিনে হায়দ্রাবাদ শহরে তো প্রতি বছর শুধুমাত্র ছোটদের জন্য হয় এক বিশেষ চলচ্চিত্র উতসব।

বড় হয়ে তো অবশ্যই দেখতে যাবে এইরকম কোন এক উতসব। আর আগামি বছর নভেম্বর মাসের শুরুতে যদি সুযোগ পাও, তাহলে বাবা মার সঙ্গে দেখতে যেও একটা বা দুটো ছবি - কলকাতা চলচ্চিত্র উতসবে।

মহাশ্বেতা রায়
কলকাতা

বায়োস্কোপের বারোকথা: সেই প্রথম ছবি

চার্লি চ্যাপলিন, লরেল -হার্ডি, গুপি গাইন বাঘা বাইন, বাড়ি থেকে পালিয়ে, সোনার কেল্লা, সাউন্ড অফ মিউজিক, স্পাইডারম্যান, হ্যারি পটার- নামগুলোকে একসাথে বললাম কেন? - কারণ, এগুলি সব আমাদের অত্যন্ত প্রিয় কতগুলো ফিল্ম বা ছবি এবং চরিত্রের নাম। প্রজাপতির মত গোঁফ ওয়ালা চার্লি, আর মোটা হার্ডি -রোগা লরেল এর কান্ডকারখানা দেখে আমরা হেসে লুটিয়ে পড়ি, গুপি-বাঘার গান শুনে মুগ্ধ হই, সোনার কেল্লায় ছোট্ট মুকুলকে খুঁজতে বেরই ফেলুদার সঙ্গে, আবার স্পাইডারম্যান আর হ্যারি পটার এর আশ্চর্য সব ক্ষমতা দেখে তো চোখ একেবারে গোল গোল হয়ে যায়! কিন্তু দেখতে দেখতে কখনো ভেবে দেখেছ কি, কিরকম ভাবে শুরু হল এই সব ফিল্ম বা ছবি তৈরি? কারা প্রথম ভেবেছিলেন এই আশ্চর্য মাধ্যমের কথা, যা কিনা জীবন কে অনুকরন করবে? যে মাধ্যমে চরিত্র রা সব কথা বলবে, গান গাইবে, নাচ করবে, যুদ্ধ -মারামারি ও করবে, আবার ভালবাসার কথাও বলবে! যে মাধ্যম ভালো বই এর মত আমাদের শোনাবে এবং দেখাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কত রকমের গল্প!

হয়েছিল কি, উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে, অর্থাৎ প্রায় একশো বছরের ও বেশ কিছু আগে, যাঁরা ছবি নিয়ে মাথা ঘামান, তাঁরা সবাই চাইছিলেন যে কি করে ছবিকে গতি দেওয়া যায়। কেননা তাহলে চলমান ছবির এই মিছিল হয়ত বাস্তবের আরো কাছাকাছি আসবে।আটলান্টিকের এপারে ও ওপারে নানা গুণী মানুষ এইসব নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন ইংল্যান্ড এর ফটোগ্রাফার এডোয়ার্ড মাইব্রিজ। তিনিই প্রথম একটি চলমান ঘোড়ার ছবি তোলেন, ঘোড়ার চলার পথের পাশে সারি সারি অনেকগুলি ক্যামেরা বসিয়ে। ওদিকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ছিলেন টমাস আল্ভা এডিসন, যিনি আমাদের কাছে বেশি পরিচিত "লাইট বালব" এর উদ্ভাবক হিসাবে। তিনি উদ্ভাবন করেন "কিনেটোস্কোপ" নামে এক যন্ত্র, যেখানে একটি ছোট ছিদ্রে চোখ লাগিয়ে ভেতরের চলমান ছবি দেখা যেত।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু শিকে ছিঁড়ল ফ্রান্সের লুমিয়ের ভাইদের কপালে। অগাস্ট এবং লুই লুমিয়ের ছিলেন দুই ভাই যাঁরা একই রকম পরীক্ষা -নিরিক্ষা চালাচ্ছিলেন। তাঁদের ব্যাবহার করা যন্ত্রের নাম ছিল সিনেম্যাটোগ্রাফ। বলা হয়ে থাকে, ১৮৯৫ সালের কনকনে ঠান্ডায় বড়দিনে তাঁরা প্রথমে লিঁও শহরে, তারপরে প্যারিসে তাঁদের প্রথম কয়েকটি ছবি দেখান। দিনটা স্মরণীয়, কারন আর কেউ তার আগে, যাকে আমরা ছায়াছবি বলি, তা দেখানোর সুযোগ পাননি মানুষ কে। এই ছবিগুলি ছোট ছিল, আর

তাতে কথা বা শব্দ ছিল না।

ছবির বিষয় কিরকম? - যেমন, কারখানা থেকে বেড়িয়ে আসছে একদল শ্রমিক, বা ট্রেন ঢুকছে কোন রেল স্টেশনে, এইসব। আসলে, সেই আদিযুগে, কি করে আলো কমাতে বাড়াতে হয় তা জানা ছিল না। ক্যামেরাকে কিভাবে নড়াতে হয় তাও জানা ছিল না। ক্যামেরাকে দাঁড় করিয়ে রেখে এক রিলের মধ্যে যতটা দেখান যায়, ততটাই দেখানো হত। আজকের ছবির মত এত কারিকুরি সেখানে ছিল না।

একবার তো যা ঘটল তা রীতিমত মজার। লুমিয়ের ভাইয়েরা ছবির আয়োজন করেছেন। আর তাতে যথারীতি রেলগাড়ী পর্দা দিয়ে এগিয়ে আসছে। দর্শকরা ভাবল এই বুঝি ট্রেন তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। হুড়োহুড়ি করে তারা দরজা দিয়ে বাইরে চলে যেতে চায় ভয়ে। তাদের বুঝিয়ে শান্ত করতে কত যে সময় গেল!!

সে যুগের মানুষ সিনেমাকে খুব যে শিল্প -টিল্প ভেবেছিল এমন কিন্তু নয়। তাদের ধারনা ছিল, গ্রামের মেলায় বা শহরের ফুটপাথে যেরকম কিছু মজার ভানুমতীর খেলা আয়োজন করা হয়, এ সেরকমই। ছবিগুলো নড়ছে, নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে, হাসছে - আমরা বলতে পারছি বিজ্ঞান কত এগিয়ে গেছে!

ছবি কিন্তু গল্প বলা শিখবে আরো পর থেকে।

[চলবে]

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়
কলকাতা

পরশমণি: আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু

লজ্জাবতী গাছ দেখেছ? যাকে ইংরেজি তে ডাকা হয় টাচ-মি-নট বলে? যদি এই গাছের পাতাগুলো একটু হাত দিয়ে ছুঁয়ে দাও, দেখবে আঙ্গুল লাগার সঙ্গে সঙ্গে মেলে থাকা পাতাগুলো গুটিয়ে যাবে। আবার বেশ কিছুক্ষন পরে ধীরে ধীরে পাতাগুলো আগের অবস্থায় ফিরে আসে। ছোঁয়ামাত্র গুটিয়ে যায় বলে এই গাছের নাম লজ্জাবতী - যেন লজ্জা পেয়ে মুখ লুকিয়েছে।

গাছ লজ্জা পায় - ভাবলে অবাক লাগে না? লজ্জা হয়ত সত্যি সত্যি পায়না, কিন্তু গাছটা হাতের ছোঁয়া বা স্পর্শ অবশ্যই বুঝতে পারে। গাছের যে প্রাণ আছে, স্পর্শবোধ আছে, গাছের কোন অংশ কাটলে বা টেনে ছিঁড়লে যে গাছের ও ব্যথা লাগে, আমাদের মত গাছেদের ও খুব ঠান্ডা বা খুব গরমে কষ্ট হয়, একথা আমাদের প্রথম কে জানিয়েছিলেন বলতো? আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে, এই কথা আমাদের জানিয়েছিলেন বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু। ২০০৮ সালে তাঁর জন্মের ১৫০ বছর পালন করা হচ্ছে।

জগদীশ চন্দ্রের জন্ম হয় ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর। বড় হয়ে তিনি ইংল্যান্ড এ যান চিকিতসা বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করতে। কিন্তু সেই পড়াশোনা তিনি করতে পারেননি অসুস্থতার কারনে। তার বদলে তিনি কেম্ব্রিজ ও লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা নিয়ে পড়াশোনা করেন। ১৮৮৪ সালে তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হিসাবে কাজে যোগ দেন। সারাদিন কলেজে পরিশ্রম করে তিনি রাত জেগে তাঁর গবেষণা চালাতেন। তখন কলেজে ভাল ল্যাবরেটরি ছিলনা, একটা ছোট্ট ঘরে তিনি নিজের গবেষণা করতেন। তিনি নিজের হাতে বেশিরভাগ যন্ত্রপাতি তৈরি করতেন। তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনে জগদীশ চন্দ্র অনেকরকম আবিষ্কার করেন এবং নানারকম সুক্ষ্ম যন্ত্র তৈরি করেন। সেইসব যন্ত্র এখনো রাখা আছে কলকাতার বসু বিজ্ঞান মন্দিরে। তাদের মধ্যে কিছু কিছু যন্ত্র কিন্তু এতই সুক্ষ্ম এবং আধুনিক যে আজ ও দিব্বি ব্যবহার করা যায়।

জগদীশ চন্দ্র বসু এক সঙ্গে নানারকম বিষয় নিয়ে পরীক্ষা নিরিক্ষা করতেন - সে পদার্থ বিদ্যার বিভিন্ন দিক ই হোক বা উদ্ভিদ বিজ্ঞানের নানান বিষয় ই হোক। তাঁর অনেক রকম গবেষনার মধ্যে তিনি যে দুটির জন্য সবথেকে পরিচিত, তার মধ্যে একটি তো আগেই বলেছি। তিনি 'ক্রেস্কোগ্রাফ' নামে এক যন্ত্র তৈরি করেন। এই যন্ত্র দিয়ে মাপা যায় একটা গাছ প্রতি সেকন্ড এ কতটা করে বাড়ছে। গাছের গায়ে ইলেকট্রিক শক দিয়ে, নানারকম রাসায়নিক ব্যবহার করে তিনি দেখান যে গাছ ও বিভিন্ন ভাবে তার প্রতিক্রিয়া জানায়।পদ্ম ফুল সূর্য ওঠার পর পাপড়ি মেলে আর দিনের শেষে গুটিয়ে

নেয়। সূর্যমুখী ফুলের কুঁড়ি সূর্যের দিক বদলের সাথে সাথে মাথা ঘোরায়। একটা গাছকে অন্ধকারে রাখলেও সে ঠিক আলোর দিকে মুখ করে বাড়তে থাকে। জগদীশ চন্দ্রই আমাদের প্রথম জানান যে গাছ গুলি এইরকম করে উষ্ণতার পরিবর্তনের জন্য। গাছেদের সম্পর্কে এইরকম আরো নানা তথ্য আমরা জানতে পারি তাঁর গবেষনার থেকে।

আরেকটি গবেষনা, যার জন্য তিনি বিখ্যাত, হল ওয়্যারলেস প্রযুক্তি নিয়ে তাঁর চিন্তাভাবনা। রেডিও আবিষ্কারের শিরোপা যদিও ব্রিটিশ বিজ্ঞানী মার্কনি কে দেওয়া হয়েছিল, এখন কিন্তু এটা সারা পৃথিবী স্বীকার করে নিয়েছে যে জগদীশ চন্দ্রই প্রথম এই প্রযুক্তি আবিষ্কার করেন। সেই সময় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অনেক বৈজ্ঞানিক দের মত কলকাতায় বসে জগদীশ চন্দ্র ও এই বিষয়ে অনেক গবেষনা করেন এবং মার্কনির পরীক্ষার অনেক আগেই অনেকদূর কাজ করে ফেলেছিলেন।

কিন্তু তাহলে তখন তাঁর নাম লোকে জানতে পারেনি কেন? আসলে, তিনি ছিলেন একজন সাধকের মত।তিনি চাইতেন তাঁর পড়াশোনা এবং গবেষনা সবার কাজে লাগুক। তিনি তাঁর যাবতীয় ভাবনা চিন্তা সবার সামনে তুলে ধরতেন। তাই তিনি মাত্র একবার এক বন্ধুর অনুরোধ ছাড়া আর কোনদিন তাঁর কোন আবিষ্কারের জন্য "পেটেন্ট" বা স্বত্বাধিকার দাবি করেননি।

তিনি কিন্তু শুধু বৈজ্ঞানিক ছিলেন না। তিনি ছিলেন বাংলা ভাষায় প্রথম বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প বা সায়েন্স ফিকশন এর লেখক। তাঁর লেখা সেই বইটির নাম "নিরুদ্দেশের কাহিনী"।

জগদীশ চন্দ্রের আগে অবধি সারা পৃথিবী ভার

জানা-অজানা: ঘুড়ির ইতিহাস

ছোটোবেলার যে খেলাগুলো সবচেয়ে আনন্দদায়ক তারমধ্যে ঘুড়ি ওড়ানো অবশ্যই অন্যতম। শিশু বয়সের ছুটন্ত মন নীল আকাশে ভেসে চলা পাখির মতোই উড়তে চায়। ঘুড়ি ওড়ানোর মধ্যে ওড়বার এই আনন্দ অনেকটা উপভোগ করা যায় বলে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই ঘুড়ি ওড়ানো ছোটোদের অতি জনপ্রিয় খেলা। তবে ঘুড়ি শুধুই যে ছোটোরা ওড়ায় তা কিন্তু নয়,বড়রাও ঘুড়ি উড়িয়ে থাকেন। আমেদাবাদ বা লখনউর মহিলারাও ঘুড়ি ওড়ান।

ঘুড়ির আবিষ্কার হয়েছিলো কোথায়? কেই বা এই সুন্দর খেলার বস্তুটি আবিষ্কার করেছিলেন? তা সঠিকভাবে কিছু জানা যায় না। তবে শোনা যায় ৪০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে গ্রীসের ট্যারাস্টাস শহরের আর্কিটাস নামে এক ভদ্রলোক প্রথম ঘুড়ি তৈরী করেছিলেন। আবার কেউ কেউ মনে করেন ২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে হান সিন নামে চীন দেশের এক সেনাপতিই প্রথম ঘুড়ি তৈরী করেন। আগে সিল্ক কাপড় দিয়ে ঘুড়ি তৈরী হতো। কাগজ আবিষ্কারের পর,কাগজের ঘুড়ি তৈরী শুরু হয়।

ইউরোপ বা আমেরিকায় ঘুড়ি ওড়ানোর রেওয়াজ থাকলেও চীন, জাপান, কোরিয়া, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়ার মত পূর্ব এশিয়ার দেশ গুলোতেই এই খেলার জনপ্রিয়তা বেশি। যদিও আকাশ পরিষ্কার থাকলে ও অনুকূল বাতাস পেলেই ঘুড়ি ওড়ানো যায় তবুও পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই একটি বিশেষ দিনকেই ঘুড়ি দিবস রূপে পালন করা হয়ে থাকে। এই দিন সবচেয়ে বেশি ঘুড়ি আকাশে উড়তে দেখা যায়। সবাই এই বিশেষ দিনটির কথা ভেবেই যেন নিজেদের প্রস্তুত করতে থাকেন।

চীনদেশে ঘুড়ি দিবসের দিন সব বয়সের নারী ও পুরুষ ঘুড়ি উড়িয়ে থাকেন। বিচিত্র বর্ণের, বিচিত্র আকারের অসংখ্য ঘুড়ি সারা আকাশ রাঙিয়ে তোলে। ওদেশের ঘুড়ি গুলির রঙ ও আকার আমাদের দেশের ঘুড়ির চেয়ে অনেক বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ। রঙবেরঙের সুন্দর মাছ,প্রজাপতি,ড্রাগন, পাখি, মানুষ, পরী, জাহাজ ইত্যাদি প্রায় তিনশো রকমের ঘুড়ি আকাশে উড়তে দেখা যায়। আর সবচেয়ে মজার ঘুড়ি হলো লন্ঠন ঘুড়ি। রাত্রিবেলায় এই ঘুড়ির মধ্যে লন্ঠন বসিয়ে ওড়ানো হয়।

আমদের দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই রকমই বিভিন্ন ঘুড়ি দিবসে ঘুড়ি ওড়ানো হয়ে থাকে। রাজস্থান ও আমেদাবাদে মকর সংক্রান্তির দিন, মধ্যভারতে দশেরার দিন, উত্তর ভারতে রাখী বন্ধনের দিন আর পশ্চিমবঙ্গে বিশ্বকর্মা পুজোর দিন। শুধু এই দিন গুলোতেই কেন বেশি ঘুড়ি ওড়ানো হয় তার কোনো সঠিক সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। তবু সবক্ষেত্রেই এর পিছনে কোনো কাহিনী প্রচলিত আছে।

আমাদের দেশের ঘুড়ির সাথে মালয় বা মালয়েশিয়ার ঘুড়ির কিছু মিল দেখতে পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গে দুটি কাঠি দিয়ে তৈরী বর্গাকৃতির ঘুড়ি যার আকারগত কোনো বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় না। কেবল নানা রঙের কাগজ দিয়ে বিভিন্ন ডিজাইনে তৈরী করা হয়ে থাকে। ডিজাইন মতো তাদের বিভিন্ন নামে ডাকা হয়,যেমন চাঁদিয়াল,ঢুপিয়াল,ঘয়লা,চৌরঙ্গী ইত্যাদি। ভারতবর্ষের অন্যত্র বিভিন্ন দেশের নেতা বা সিনেমার নায়কদের ছবি ঘুড়িতে লাগিয়ে ওড়ানো হয়ে থাকে।

মুসলমান আমলে বিভিন্ন সময়ে নানা রকমের ঘুড়ি দেখা গেছে। যেমন কানকাওয়া,চংগ,তুলকল, পতংগ,গুডডি প্রভৃতি। এইসব ঘুড়ি গুলি তৈরী করা ছিলো যেমন শ্রমসাধ্য তেমনি খরচ সাপেক্ষ। দিল্লীর রাজা শাহ আলমের আমল থেকেই ঘুড়ি ওড়ানোটা ভারতবর্ষে খেলা হিসেবে মনে করা হয়। নবাবী আমল ছিলো পেশাদার ঘুড়ি উড়িয়েদের সুবর্ণ যুগ। তখন ঘুড়ি ওড়ানোর ওপর বাজী ধরা হত যা হত উড়িয়েদের প্রাপ্য।

লখনউ থেকে কলকাতায় প্রথম ঘুড়ি এনেছিলেন নবাব বংশের বিলায়েত আলি। সেই থেকেই কলকাতায় ঘুড়ি ওড়ানোর রেওয়াজ। উনবিংশ শতকে কলকাতার বাবু সমাজের বাবুরা মাঞ্জাহীন সুতো দিয়ে ঘুড়ি ওড়াতেন। তাদের ঘুড়িতে আটকানো থাকতো পাঁচ, দশ বা একশো টাকার নোট।

ঘুড়ির প্যাঁচ বা কাইট ফাইটিং প্রায় সব দেশেই খেলা হয়ে থাকে। তবে এই ব্যাপারে সবচেয়ে মাতামাতি হয় থাইল্যান্ডে। ওখানে ঘুড়ির লীগ প্রতিযোগিতা হয়। শীতকালে আমাদের কলকাতার মাঠে এই ধরনের প্রতিযোগিতা দেখতে পাওয়া যায়।

ঘুড়ি ওড়ে কিভাবে? ঘুড়িতে সুতো দিয়ে মাটি থেকে নীচের দিকে টান দেওয়া হয়। আর ঘুড়ির ওপর উর্দ্ধমুখী কাজ করে বাতাসের আকর্ষণ শক্তি। এই দুটো টান যতক্ষণ সমান থাকে ততক্ষণ ঘুড়ি আকাশে উড়তে পারে।

শুধু খেলার সামগ্রী হিসেবে পরিচিত হলেও অনেক সময়ে এই ঘুড়িই বিজ্ঞানের নানা গবেষণায় সাহায্য করেছে। যেমন ১৭৪৯ সালে আলেকজান্ডার উইলসন ঘুড়িতে থার্মোমিটার লাগিয়ে উর্দ্ধাকাশের তাপমাত্রা নির্ণয়ের চেষ্টা করেছিলেন। ১২ ডিসেম্বর ১৯০১ সালে ঘুড়ির মধ্যে অ্যান্টেনা লাগিয়ে নিউফাউন্ডল্যান্ডের বৈজ্ঞানিক মার্কনি আকাশের ইলেকট্রোম্যাগনেটিভ ওয়েভ ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৭৫২ সালে বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ফ্র্যাংকলিন আকাশে একটি সিল্কের ঘুড়ি উড়িয়ে তার সাহায্যে কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত বিদ্যুত ও আকাশের বিদ্যুত যে এক তা প্রমাণ করেছিলেন।

যুদ্ধের নানা কাজেও ঘুড়ি ব্যবহার করা হয়েছে পৃথিবীর নানাপ্রান্তে। প্রায় হাজার বছর আগে চীন দেশের এক সেনাপতি হানসিন নিজের শিবির থেকে শত্রু পক্ষের কেল্লার দূরত্ব মাপবার জন্য আকাশে ঘুড়ি উড়িয়ে দিয়েছিলেন। পরে লাটাইয়ের সুতো মেপে তিনি সেই কেল্লার দূরত্ব জেনে গিয়েছিলেন। এছাড়া ঘুড়িতে ক্যামেরা বেঁধে শত্রু পক্ষের ছবি তোলা বা ঘুড়িতে বিস্ফোরক বেঁধে শত্রুপক্ষের জাহাজ ধ্বংস করার ঘটনা বিরল নয়।

অশোক দাশগুপ্ত
কলকাতা

<u>এক্কা-দোক্কা: পিবে-ডি-অরো</u>

তোমার স্কুলে যাওয়ার পথে কিম্বা বাবা মার সাথে বেড়াতে যাওয়ার সময় কখোনো কি চোখে পড়েছে ছেঁড়া জামা...ধুলো গা...করুণ মুখের কোনো ছোট্টো বাচ্চাকে? যে সারা সকাল কাজ করছে অথবা আপন মনে খেলে চলেছে ফুটপাথের ধারে। একটু খেয়াল কোরো, নিশ্চই দেখতে পাবে। কখোনো সেও হয়তো ফিরে দেখবে তোমাকে, চাইবে তোমায় বন্ধু করতে।

ভাবছো তো কেন বলছি এতো সব কথা। আসলে ঠিক এরপর থেকে বেশ কিছুক্ষণ আমরা এমন একটা মানুষের সঙ্গে থাকবো,সময় কাটাবো, যার ছোটোবেলাটা কেটেছিলো ভিলা ফিওরিতোর ফুটপাথে খুব কষ্টের সঙ্গে। উস্কোখুস্কো চুল,খালি গা,ঢোলা হাফপ্যান্ট। ছেলেটাকে সবাই চিনতো। কারণ একটু রুটির লোভ দেখালেই ছেলেটা অসাধারণ খেলতো। কোনো হারা খেলা জিতিয়ে দিতো অনায়াসে। ডিমান্ড বাড়ছিলো ছেলেটার। ফুটপাথের রাস্তা থেকে পাশের পাড়া...তার পাশের পাড়ায় ডাক পড়ছিলো। আর অবাক হয়ে সবাই দেখছিলো ওই অতটুকু ছেলেটার খেলার ছন্দ। কিছুদিনের মধ্যেই সবার মুখে মুখে ফিরতে থাকলো পিবে-ডি-অরো...পিবে-ডি-অরো। মূল স্প্যানিশ থেকে বাংলায় করলে যার অর্থ সোনার ছেলে।

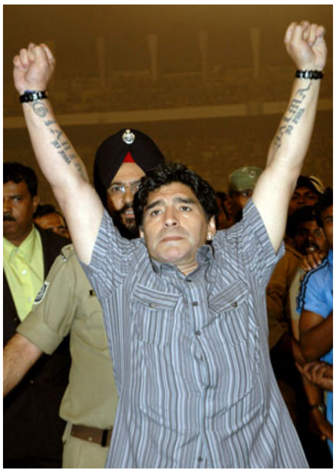

এইতো সেদিন কলকাতায় এসে ছিলেন সেই সোনার ছেলে মারাদোনা। গোটা শহর মেতে ছিলো তাঁকে

নিয়ে। ফুটবলের জাদুকর উজার করে দিলেন তাঁর সব ভালোবাসা এই শহরকে। বারবার বললেন আমি তোমাদেরই লোক। আর কলকাতা বললো, তুমি আমাদের সোনার ছেলে।

ভিলা ফিওরিতো আর্জেন্টিনার বুয়েনেস আয়ারসের একটা বস্তির নাম। যেখানে ড্রাগ মাফিয়া থেকে চোরাকারবারি সবার অবাধ যাতায়াত, বলা যায় বিচরণ ক্ষেত্র। মারপিট,খুন-রাহাজানির নিত্য নতুন ঝামেলা। বস্তিটা যেন একটা নরক। এখানেই জন্ম দিয়েগোর। পুরো নাম দিয়েগো আরমান্দো মারাদোনা। কলকাতায় মারাদোনা সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন তাঁর নামের রহস্য। আসলে তাঁর বাবার নাম দিয়েগো আর মায়ের নাম আরমান্দো। দুইয়ে মিলে দিয়েগো আরমান্দো। দিয়েগোরা আটজন ভাইবোন। বাবা মাকে নিয়ে পরিবারের সদস্য সংখ্যা দশজন। একে রোজ ভরপেট খাওয়া জোটে না। তারপর দশজনে ভাগ করে খাওয়া। ঠিক এমন এক পরিবেশ থেকে উঠে এসেছিলেন ফুটবলের সেরার সেরা মারাদোনা।

ভাবছো তো কি করে এটা সম্ভব হলো। আমি বলোবো, নিরলস চেষ্টা আর ফুটবলকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসা। কাজেই ঢোলা হাফপ্যান্টের সেই উস্কোখুস্কো ছেলেটার জীবনের প্রতিটা বাঁকে যে রূপকথার ছোঁয়া থাকবে তা মনে হয় আর বলার অপেক্ষা রাখে না। মাত্র তিন বছর বয়সে ফুটবলের সাথে প্রথম পরিচয়। মারাদোনার কোনো এক তুতো ভাই তাঁর দিকে খেলার জন্য ছুঁড়ে দিয়েছিলেন ফুটবল। সেই প্রথম থেকেই সারাদিনের এমনকি রাতের ঘুমোনোর সঙ্গীও ওই চামড়ার গোলকটা। এর পিছনে কি ছিলো কোনো সঙ্কল্প,জেদ? মারাদোনা বলেছেন...তার থেকেও অনেক বেশি-ভালোবাসা। ফুটবলকে ভালোবাসা। তাঁর জীবনের সুখ,দুঃখ,হতাশা,ভালোবাসা...এমনকি বাঁচাটাও ওই ফুটবলকে ঘিরে। টিভিতে নিশ্চই দেখেছো বুকের বাঁদিকে মুষ্ঠিবদ্ধ হাত বারবার চাপড়াচ্ছেন। ওটার মানে কি জানো?"আমি আছি আমার হৃদয় দিয়ে...আমার এই হৃদয় তোমার জন্য...তোমাদের জন্য।"

ভাবতে পারো মোহনবাগান মাঠের ঘাসে জীবনে প্রথম পা রাখলেন, সেই ঘাস পাগলের মতো চুমু খেলেন-একবার নয় বারবার। পৃথিবীর যে কোনো মাঠকেই মারাদোনা এমন তীব্র ভালোবাসতে পারেন। কারণ ভিলা ফিওরিতো তাঁর পিছু ছাড়ে না কখোনো। আর ছাড়বেই বা কি করে? আর্জেন্টিনার মানুষ যে তাঁর নামে একটা চার্চ বানিয়েছেন। সেই চার্চে ফুটবলের ভগবান মারাদোনার পুজো হয়। ২৫ শে ডিসেম্বর নয় পালিত হয় ৩০ শে অক্টোবর মারাদোনার জন্মদিন। সেই দিন তাঁর নামে প্রার্থনা সঙ্গীত গাওয়া হয়। কি দারুন মজার না ব্যাপারটা। মারাদোনা শিশুদের ভালোবাসেন। তাদের দুঃখে কাঁদেন গোপনে, ভেতরে ভেতরে। এক ধূসর শৈশবকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন বলেই কি বারবার ফিরে

যাওয়া শৈশবে? কেমন শিশুর মতো আনন্দে আটচল্লিশ বছরের মারাদোনা বলে উঠলেন," মা বলেছে আমিই সেরা...অতএব এটা নিয়ে আর কোনো প্রশ্নই হয় না...পেলে নয় আমি সেরা।" আরো কয়েকটা দৃশ্য যা আমি কোনো দিনও ভুলবো না... মারাদোনা গিয়েছেন মহেশতলায়। ইন্ডিয়ান ফুটবল স্কুলের উদ্বোধন হবে। ছোট্ট রাজর্ষি চট্টোপাধ্যায়ের হাত থেকে চে গুয়েভারার ছবি উপহার নেওয়ার পরে তাঁর আনন্দের জোয়ার। বারবার জড়িয়ে ধরলেন রাজর্ষীকে। চুমু খেলেন।

মোহনবাগান মাঠের বাইরে ছমিনিট অপেক্ষা করে নির্দেশ পাঠালেন,"পুলিশ সরিয়ে নিন। আমি শিশুদের সঙ্গে, জনতার সঙ্গে যেমন খুশি খেলবো।" এরপর বাকিটা তো ইতিহাস। আসলে মারাদোনার উপমা কোনোদিন কোনো খেলায় তৈরী হয় নি, আর হবেও না। এমনই তীব্র তাঁর উপস্থিতি। যিনি নিজেকে নিংড়ে ভালোবাসতে পারেন। ভালোবাসাতে পারেন। এক বর্ণময় সাফল্যের কাহিনী মারাদোনা। সেই বস্তির ছেলেটা...সেই পিবে-ডি-অরো আজ ফুটবলের ভগবান। আমদের ভালোবাসার এক স্বপ্ন।

লেখা - উপালি
ছবি - রনি রায়
কলকাতা

আঁকিবুকি

পাতা ঝরার দিন
অনুভব শেঠ, ৬ বছর, বেইজিং

রেনি ডে
সম্পূর্ণা ঘোষ, ৮ বছর, লন্ডন

সকালবেলা
সৃজনী ঘোষ, ৭ বছর, কলকাতা